পাহাড়ে বাঙালি

সাত্যকি হালদার

পশ্চিমবঙ্গের যে অংশে গত দু'বছর কাটিয়ে এলাম তাকে কি কোনও অর্থে বঙ্গভূমি বা বাঙালির দেশ বা বাংলার অংশ বলা যাবে! অথচ ভারতের প্রাদেশিক বিভাজন অনুযায়ী সেই অঞ্চল তো পশ্চিবঙ্গেরই অংশ— পশ্চিমবঙ্গই! অথচ সেখানকার শতকরা একশো জন লোকই বিশ্বাস করে তারা ভারতে বাস করে অথচ পশ্চিমবঙ্গে নয়। বাংলা, বাঙালি, বাংলা ভাষা তাদের কাছে অতি তুচ্ছ কিছু শব্দ—যে শব্দগুলিকে হামেশাই তাচ্ছিল্য বা অমর্যাদা করা যায়। করলে কোথাও কারও কিছু যায় আসে না। নতুন নতুন চুক্তি, আশ্বাস, কোটি কোটি টাকার আর্থিক অনুদান সত্ত্বেও তারা সকলেই মনে প্রাণে বঙ্গভূমির বাইরে।

শিলিগুড়ি বাদ দিয়ে দার্জিলিং জেলার যে বিপুল পার্বত্য অংশ, , যার মধ্যে দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং মহকুমা সেখানে আপনি বেড়াতে যান কোনও সমস্যা নেই (সমস্যা একেবরে নেই তা নয়, ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে গোর্খাল্যান্ড বিরোধী কথা বলুন— দেখবেন) কিন্তু জমি কিনে বাড়ি বানাতে গেলেই মহা হাঙ্গামা। ভারতের নাগরিক অধিকার অনুসারে আপনার হক রয়েছে দেশের যে কোনও জায়গায় সুস্থিত হওয়ার। কিন্তু দার্জিলিং পাহাড়ে আপনি বাঙালি হলেই যত আপত্তি। বলাই বাহুল্য প্রশাসনের প্রকাশ্য আপত্তি থাকবে না, কিন্তু প্রশাসন এবং স্থানীয় মানুষের প্রচ্ছন্ন অথচ প্রবল আপত্তি থাকবে। প্রথমত বাঙালি হলে আপনাকে কেউ জমি-বাড়ি বেচবেই না। যদি বা পাহাড়ের ঢালে কোনও পছন্দসই জায়গা নিয়ে কথা বলতে যান দেখবেন স্থানীয় বিএলআরও থেকে আপনার জমির প্রতিবেশী সকলেরই ঘোর আপত্তি— কিছুতেই আপনাকে পাহাড়ে স্থায়ীভাবে বসত গড়তে দেওয়া যাবে না। অথচ অনেক সহজে ও অনেক কম দামে মারোয়ারি কিংবা বিহারিরা পাহাড়ে জমি বা বাড়ি পেয়ে যাচ্ছে। কালিম্পং মেইন রোডে আজ আর একটি স্থানীয় মানুষের দোকান নেই। সবই মারোয়াড়ি ও বিহারিদের হাতে। কিন্তু কোথাও কোনও গ্রামেও মালদা কিংবা দিনাজপুর থেকে যাওয়া কোনো গরিব মানুষ যদি একটা পান-গুমটি খুলতে চায় তা হলেই হৈ হৈ রৈরৈ। কিছুতেই তকে খুলতে দেওয়া হবে না। অথচ অন্য প্রদেশের লোকেরা পাহাড়ে বসবাস শুরু করেই রাতারাতি গোর্খাল্যান্ডের 'সাপোর্টার' ও 'স্পনসার' হয়ে উঠছে, মিটিং মিছিলে যচ্ছে, অথচ এ নিয়ে সারা দেশেই কোথাও কোনো হেলদোল নেই।

তাই বলে কি পাহাড়ে বাঙালি ছিলই না, বা নেই। কালিম্পং এক সময় বহু বাঙালির স্থায়ী ঠিকানা ছিল। যার প্রমাণ কালিম্পং কালীবাড়ি, রবীন্দ্র স্মৃতিধন্য দু'টি বাড়ি এবং শহরের মূল অঞ্চল লাগোয়া বহু পুরনো আবাস। কিন্তু আশির দশকে প্রথম গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সূচনায় এই আবাসিকদেরই মেরে, কেড়ে, ভয় দেখিয়ে, বাঙালি হিসাবে অপমান করে পাহাড় থেকে বিতাড়ন করা হয়েছে। প্রায় সমস্ত বাঙালিই প্রাণের দায়ে ও পরিবারের নিরাপত্তার চিন্তায় পাহাড় থেকে নেমে চলে এসেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙালি মহল্লায় যখন আগুন লাগানো হয়েছে বা তাদের তাড়ানো হয়েছে তখন হিন্দু বিহারিরাও তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। সেইসব বিহারিরা অনেকেই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। একই ঘটনা ঘটেছে কার্শিয়াং ও দার্জিলিঙেও। তবে গ্রামের দিকে এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটেনি। কারণ বাঙালিরা চাকরি ও ব্যবসার কারণে প্রথম থেকেই পাহাড়ের মূল তিনটি শহরে থেকেছে, গ্রামের দিকে খুব একটা য়ায়নি। মালদার চর বা পূর্ব্ববঙ্গের রংপুর, কুড়িগ্রাম বা সিরাজগঞ্জ থেকে যে সব বাঙালি অভিবাসিত হয়ে উত্তরবঙ্গে এসেছে তাদের সামান্য অংশই পাহাড়ের গ্রামে গিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ে পর্যটক হিসাবে বেড়াতে যাওয়া এবং স্থায়ীভাবে থাকা দু'টি আলাদা ঘটনা, দু'টি আলাদ অভিজ্ঞতা। পর্যটক হিসাবে যেমন কোনও ঘটনা বা কোনও দূরত্বের আঁচ পাওয়া যায় না, তেমনি উল্টোদিকে বাঙালিত্বের সহজ জীবন-যাপন করতে গেলে ওখানে পদে পদে বিপত্তি। পশ্চিমবঙ্গেরই অংশ, অথচ সেখানে স্বাভাবিক বাঙালি জীবন-যাপনের কোনও সুযোগ নেই। পাহাড়ে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক মানের স্কুল থাকলেও সেখানে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে পড়ানোর জন্য হিন্দি আছে, নেপালি আছে, জোংখা আছে, তিব্বতি আছে, আশ্চর্য্যের হলেও কোথও কোথাও চিনা ভাষাও আছে, কিন্তু বাংলা নেই। অথচ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ মিলিয়ে হস্টেলে যে সংখ্যক বাঙালি ছাত্রছাত্রী থাকে তা নিতান্ত কম নয়, ভুটানি, তিব্বতি বা নেপালি ভাষী ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিজস্ব ভাষা শেখার ব্যবস্থা থাকলে বাঙালিদের জন্য থাকবে না কেন? বাঙালিরা তো অন্য প্রদেশে পড়তে যায়নি, তারা তো বঙ্গভূমিতেই পড়ছে! এ ব্যাপারে কথা বলতে গেলে স্কুলগুলি অজুহাত দেখায় যে বাংলা পড়ানোর শিক্ষক পাওয়ার অসুবিধা। কিন্তু এ নিতান্ত ছেঁদো যুক্তি। যে স্কুলগুলিতে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি পড়ানোর শিক্ষক দিল্লি বা কলকাতা থেকে যাচ্ছে সেখানে বাংলা বিভাগ খুললে কলকাতা বা শিলিগুড়ি থেকে পড়াতে যাওয়ার শিক্ষক পাওয়া যাবে না? মূল কথা হল বাংলা বিভাগ খুলে এইসব স্কুল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় গোর্খাল্যান্ড নেতৃত্বের বিরাগভাজন হতে চায় না। বাংলা খুললেই গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনকারীরা স্কুলকে নানারকম চাপ দেবে, মাঝেমাঝেই মোটা চাঁদা চাইবে এবং গোর্খাল্যান্ডের পক্ষে মাঝে মাঝে শহর জুড়ে যে পদযাত্রা হয় সেখানে ছাত্রছাত্রীদের পাঠাতে বলবে। যেসব রাজনৈতিক পদযাত্রা হয় সেখানে ছাত্রছাত্রীই স্বেচ্ছায় হাঁটে। আবার বাধ্যও কারা হয়। বারবার পদযাত্রা এড়িয়ে যেতে থাকলে বাঙালি ছাত্রটি সহপাঠীদের 'টার্গেট' হয়ে যায়। সহপাঠী এবং নেপালি - ভাষা গোর্খাল্যান্ড সমর্থনকারী শিক্ষরাও খেয়াল রাখেন বাঙালি ছাত্রটি মিছিলে গেল কিনা।

এ তো গেল শিক্ষার কথা। সংস্কৃতির অন্যান্য দিকেও পাহাড়ের বাঙালি নানাভাবে বিপন্ন। বাংলা সংবাদপত্র পাওয়া গেলেও কোনও বাংলা বইয়ের দোকান নেই। সিডি-ক্যাসেটের দোকানে বাংলা গানের কথা বললে দোকানি অদ্ভুতভাবে

তাকিয়ে থাকবে। পথেঘাটে বাংলা কথা বললে লোকজন ফিরে তাকাবে। সর্বত্রই আড়ালে 'বেংলি' বলে একটা তুচ্ছতাচ্ছিল্য। অথচ কখনও যদি বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী হিসাবে সকলেই তো বাঙালী এমনকী যারা 'বেংলি' বলছে তারাও, তা হলে মহা হাঙ্গামা। দার্জিলিং, কলিম্পং, কার্শিয়াং মহাকুমায় বাস করা নেপালি-ভাষী প্রতিটি মানুষ অন্তর থেকে এবং জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করে তারা বাঙালি নয়। বাঙালিত্বের সমস্ত অনুষঙ্গ থেকে তারা সহস্র যোজন দূরে। নৃতাত্বিকভাবে তারা চৈনিকদের কাছের হতে পারে কিন্তু বাঙালিত্বের কিছুই তাদের মতো নয়।

কিন্তু নৃতাত্ত্বিকতার সূত্রে সুন্দরবনের কোনও দ্বীপের মানুষ যদি মনে করে তারা বাঙালি নয় বরং আরাকানী মগ-দের বেশি ঘনিষ্ঠ, কিংবা মুর্শিদাবাদ - মালদহের কোনও মহকুমার মানুষ যদি মনে করে তারা বাঙলাদেশিদের কাছাকাছি তা হলে তাদের কি পশ্চিমবঙ্গ ভেঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার আন্দোলন সমর্থন করা হবে? সমর্থন করার প্রশ্নইই ওঠে না! এই কারণে যে বাঙালি জাতিসত্ত্বার ভিতরে সুন্দরবনের অস্ট্রিক জনগোষ্ঠী যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পাহাড়ের মাঙ্গোলিয়ানরাও—এই বিপুল বৈচিত্র্য নিয়েই বাঙালি। এর বাইরে যারা যেতে চায় তারা অন্য কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বা অন্য কোনও দেশের প্ররোচনায় বাইরে যেতে পারে এবং সেই গোষ্ঠীবদ্ধ মানসিকতা নিয়েই তার বাঙালিত্বের পরিচয়কে মুছে দিতে চায়।

তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার নেপালিরাই পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ের মূল এবং প্রধান জনগোষ্ঠী নয়। এর বাইরেও লেপচারা রয়েছে, ভুটিয়া ও তিব্বতিরা রয়েছে এবং রয়েছে অভিবাসিত হয়ে আসা ভারতের অন্যন্য প্রদেশের মানুষ। কিন্তু পাহাড়ে মূল ভাষা হয়ে গেছে নেপালি। তা হয়েছে গত দেড়-দু'শো বছর ধরে ভুটান, সিকিম এবং পশ্চিবঙ্গের পাহাড়ে ক্রমাগত নেপাল থেকে আসা মানুষদের কারণে। স্থানীয় মানুষদের তুলনায় নেপালি - গোর্খারা অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে ছিল, তাই গোর্খাদের সংস্কৃতিই পাহাড়ের মূল সংস্কৃতি হয়ে গেছে। তাদের ভাষায় পাহাড়ের সব মানুষ কথা বলে। গোর্খাল্যান্ডের নামে যে আন্দোলন চলে তাতে বাঙালি ছাড়া সকলেই আজ অংশগ্রহণকারী। গোর্খাল্যান্ড হলে কালিম্পঙের স্থানীয় লেপচাদের মৌলিক সংস্কৃতি যে সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে এ কথা লেপচারাও আজ আর ভাবে না। ভুটিয়া বা তিব্বতিরাও ভাবে না। বরং তাদের কাছেও গোর্খাল্যান্ড এমন এক স্বপ্ন যেখানে পৃথক রাজ্য অর্জন করতে পারলে সব পাওয়ার অবসান হবে। খুব বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকজন লেপচা মাঝে মাঝে লেপচা সংস্কৃতির কথা বলেন, লেপচাদের নিয়ে পদযাত্রা করেন। কিন্তু মূল গোর্খাল্যান্ড চাহিদার মাঝে লেপচা-ভুটিয়াদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে হতে হারিয়েই গেছে প্রায়। কিন্তু এরাও পাহাড়ের অন্যদের মতো পশ্চিমবঙ্গ বা বঙ্গভূমি ধারণার বিরোধী, বাঙালিদের পছন্দ করে না।

এর বাইরে রয়েছে পাহাড়ে থিতু হওয়া অন্য প্রদেশের মানুষ, মূলত মারোয়াড়ি ও বিহারিরা। আশ্চর্য্যের বিষয় হল এই, ভিন্ প্রদেশের মানুষেরাও চায় পশ্চিমবঙ্গের পাহাড় বাঙালি আধিপত্যহীন হোক। পাহাড় থেকে বাঙালির যে শেষ গুটিকয় আশ্রয় আছে তা মুছে যাক। এই বিহারি ও মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীরাই গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের মূল 'স্পনসর'। এরাই ভুটিয়া, তিব্বতি ও শেষপর্যন্ত নেপালিদেরও অনেক টাকায় কিনে নিয়ে পাহাড়ের সমস্ত ব্যবসায়িক জায়গাগুলি দখল করেছে। এবং অত্যাশ্চর্য তথ্যটি হল, প্রত্যহ নিয়ম করে যে সংবাদপত্রটি নেপালিতে (হিমালয় দর্শণ) এবং যে মাসিক পত্রিকাটি ইংরাজিতে (কালিম্পং টাইমস) পশ্চিমবঙ্গের 'শ্রাদ্ধ' করে চলেছে এবং গোর্খাল্যান্ডের জয়গান গাইছে, সেই দুটি পত্রিকারই মালিক দু'টি মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী। এরা নিয়ম করে পাহাড়ের মানুষের মনে বাংলা ভেঙে বেরিয়ে আসার বীজ বপন করে চলেছে। সংবাদ পত্র মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে ঠিকই, কিন্তু এক জন বাঙালি হয়ে যে কেউ যদি গুজরাত বা অন্ধ্রপ্রদেশে গিয়ে সে রাজ্য ভাগ করার পক্ষে প্রচার চালায় তা হলে তাকে কী চোখে দেখা হবে? তাকে কি রাজ্য বিরোধী এবং দেশবিরোধী হিসাবে বিবেচনা করা হবে না?

এ ছাড়াও 'স্পনসরশিপ' -এর একটি বহৎ প্রেক্ষাপটের আভাস পাহাড়ে পাওয়া যায়। কালিম্পং শহরের বহু নেপালি তথাকথিত বুদ্ধিজীবী রয়েছেন যারা 'চাইনিজ কানেকশান' নিয়ে সদা গর্বিত। নানা প্রসঙ্গে চিনের অনুষঙ্গে কথা বলেন। তিব্বতিদের সঙ্গে এক শহরে বাস করলেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই নেপালি বুদ্ধিজীবীরা কেউ তিব্বতে চিনের আগ্রাসনের বিপক্ষে বলেন না বা শহরে যখন স্বাধীন তিব্বতের দাবিতে তিব্বতিদের মোমবাতি মিছিল হয় তখন একজনও তাদের সঙ্গে হাঁটেন না। এঁরা সবাই চিনের পক্ষে। আজ যারা বাংলা ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে চাইছেন, তারা পরবর্তীকালে সিকিমের সঙ্গে জোট বেঁধে চিনের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইবে না তো? এই আশঙ্কা এখন আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সেই দুঃস্বপ্ন যত দূরেই থাক আজও তো পাহাড় ভৌগোলিক ও রাজনৈতিকভাবে বঙ্গ ভূ-ভাগেরই অংশ। কিন্তু সেই মর্যাদা পাহাড়ে বাঙালি পাচ্ছে না। নতুন করে বাংলা - ভাষী মানুষ যেন পাহাড়ে ঢুকছে না, তেমনি পুরনো বাঙালি পরিবার যে ক'টি আছে তারাও পাট ওঠাচ্ছে একের পর এক। বাঙালিদের জমি-বাড়ি-বিক্রি করাও কঠিন। কেউ কিনতে চায় না, প্রতিবেশী ভাঙানি দেয়, কারণ সে বিনে পয়সায় পুরোটা দখলের স্বপ্ন দেখে। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের ভিতরেই একটি অংশে বাঙালিত্বের চিহ্ন মুছে যায় দিনের পর দিন।